মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতন হওয়া প্রয়োজন

সেলিনা আক্তার

সুস্থতা হলো শারীরিক-মানসিক এবং সামাজিকতার ভারসাম্যপূর্ণ মেলবন্ধন। তবে বর্তমানে শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতাকেও বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে অতি গুরুত্বের সাথে। কিছু কিছু অসুখ যেমন হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, শ্বাসতন্ত্রের রোগ এগুলোর পেছনে কখনো কখনো মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদিকে কারণ হিসেবে ধরা হয়। আবার মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থেকেও হতে পারে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগ। এসব কারণে চিকিৎসকরা বলেন সার্বিক সুস্থতার জন্য শারিরীক ও মানসিক রোগের সমন্বিত চিকিৎসা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শরীরের পাশাপাশি মনকে গুরুত্ব দিয়ে মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছর ১০ অক্টোবরকে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "Young people and mental health in a changing world" (একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের তরুণ মানুষ এবং মানসিক স্বাস্থ্য)।

বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, প্রিয়জন হারানোসহ নানা ক্ষতির কারণে বিভিন্ন সময় মানুষ মানসিক কষ্টে ভোগে। বিভিন্ন কারণে মনের কষ্ট ও দুশ্চিন্তার ফলে অনেক সময় নিয়মিত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ব্যক্তি আর পারিবারিক জীবনকে দাঁড় করাচ্ছে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। এসবের জন্য দায়ী মনের অজানা রোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা।আর এইভাবেই মানসিক সমস্যার সূত্রপাত হয়।

১৩ বছরে পা দিয়েছে অভ্র। অনেক দিন থেকেই তার ঘুমে সমস্যা হচ্ছে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকছে। বাসায় কেউ কিছু বলতে গেলেই রেগে যাচ্ছে। সামনে পরীক্ষার টেনশন। অথচ পড়ায় কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। নিজের কাজগুলোও ঠিকঠাক করা হচ্ছে না। এটি অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একজন কিশোরের কথা।

রাজুর বয়স ২৫। সে অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র, মা-বাবার একমাত্র সন্তান। মা-বাবার একটাই কথা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। কিন্তু রাজু সবসময়ই টেনশনে থাকত সে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে তো? তার মধ্যে হতাশা আর দুঃশ্চিন্তা। একদিন বাড়িতে তার এক বন্ধু আসে এবং তাকে বলে সে যদি ঔষুধ খায় তাহলে তার দুশ্চিন্তা ও হতাশা সব দুর হয়ে যাবে। আর তারপর থেকেই সে ইয়াবায় আসক্ত হয়ে পড়ে। উপরের দুটি গল্প থেকেই বোঝা যায় এর মূল কারণ হচ্ছে মানসিক সমস্যা। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালিত এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে মাদকসেবী ৩ দশমিক ৩ শতাংশের মধ্যে ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সি মাদক ব্যবহারকারী ৬ দশমিক ৯ শতাংশ।

আমরা সবাই চাই সুস্বাস্থ্য বজায় থাকুক। শারীরিক যে-কোনো অসুস্থতায় আমরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই, কিন্তু মানসিক সমস্যাকে আমরা আমলে নেই না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ দশমিক ১ শতাংশ যে-কোনো ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত। অন্যদিকে ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানসিক রোগে আক্রান্তের হার ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ। আমাদের সবাইকে জীবনের কোনো-না-কোনো সময় সাময়িকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে আমাদের মাঝে একটা স্পষ্ট ধারণা কাজ করে। এর বাইরে যে-কোনো অসুস্থতা যে মানসিক সমস্যা থেকেও হতে পারে এ বিষয় ভাবতে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু, যখন দেখা যায় আমাদের স্বাভাবিক কাজগুলোও ব্যাহত হচ্ছে, তখনই মানসিক অসুস্থতার প্রসঙ্গ আসে।

মানসিক সমস্যা নানা ধরনের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী শারীরক, মানসিক, সামাজিকভাবে ভালো থাকার নামই স্বাস্থ্য। তিন ধরনের সমস্যার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা, মানসিক সমস্যা এবং মাদকাসক্তি। মন খারাপ, উদ্বেগ, ভয়- এগুলো স্বাভাবিক আবেগীয় প্রকাশ। দুঃখ বা ব্যর্থতায় যে কারো মন খারাপ হতে পারে। যে-কোনো দুঃসংবাদ, উৎকণ্ঠা এবং অনেকের ক্ষেত্রে কোনো প্রাণি, উচ্চতা বা অন্ধকারের প্রতি ভীতিবোধ ইত্যাদিও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যখন তা স্বাভাবিক মাত্রাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখনই একে রোগ হিসেবে ধরা হয়। মানসিক রোগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি নিউরোসিস, অন্যটি সাইকোসিস। মূলতঃ বিষন্নতা, উদ্বেগাধিক্য, অহেতুক ভীতি প্রভৃতি নিউরোসিসের উদাহরণ। অন্যদিকে সাইকোসিস রোগীদের আচার-আচরণ, ব্যবহার-কথাবার্তায়, বিশৃঙ্খলতা দেখা যায়। বাস্তবের সাথে তাদের সংযোগ থাকে না। অনেকের মাঝে অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন কিন্তু দৃঢ় সন্দেহ দেখা দেয়। তারা সাধারণত নিজেরা বুঝতে পারে না যে তারা রোগাক্রান্ত। আশপাশের মানুষের কাছে তাদের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীতে ৪৫০ মিলিয়ন লোক কোনো না কোনোভাবে মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত।

মানসিক সমস্যায় আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিষন্নতা। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ এর হিসাবে বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ বিষন্নতায় আক্রান্ত। আমাদের দেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বিষন্নতায় আক্রান্ত রোগী রয়েছে- ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ব্যক্তি জীবনের যে-কোনো সময় এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। গবেষকরা বলেন, বিষন্নতার কারণে আত্মহত্যার ঝুঁকি থাকে। একটি পরিসংখ্যান মতে প্রতিবছর পৃথিবীতে ৮ লাখ ৭৩ হাজার লোক আত্মহত্যা করে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর (১৮ বছর ও তদুর্ধ্ব) শতকরা প্রায় ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ যে-কোনো ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত। এই জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে উন্নয়নশীল দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় বরাদ্দকৃত বাজেট কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ হওয়া উচিত। এ বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করে সরকার মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মডেল বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট অনুযায়ী প্রায় ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। এখানে মানসিক সমস্যায় কাউন্সেলিং করা হয়। দেশে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার, ৫০৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়াও প্রতিটি জেলা সদরে হাসপাতাল এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ বিদ্যমান। এগুলোর বেশির ভাগেই মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ রয়েছে।

সুস্থ, স্বাভাবিক সম্ভাবনাময় জীবন পেতে হলে প্রত্যেক মানুষের কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থেকে নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন ব্যক্তিকে নতুন আশায় উজ্জীবিত রাখে, সুখী হতে সাহায্য করে। প্রতিদিন গোসল, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার সাথে সুষম খাবার, পুষ্টিকর খাদ্যাভাস এবং নিয়মিত ব্যায়াম সুস্বাস্থ্যের প্রধানতম বিষয়। অনিয়মিত খাবার গ্রহণ যেমন গ্যাসট্রিক-আলসারসহ শারীরিক অসুস্থতার কারণ তেমনি তা মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী হরমোনের নিঃসরণ বাড়ায়। আবার রাত জাগা দিনে ঘুমানো মস্তিস্কের বায়োলজিক্যাল ক্লক এলোমেলো করে দেয়। ফলে উদ্যমের অভাবে জড়তা এসে ভর করলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না। ক্ষুধা-ঘুম অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এভাবেই মানসিক অবসাদে ভোগে। এজন্য মনের রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকাটা খুব দরকার। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, সন্দেহ প্রবণতা, মিথ্যা বলা, অহেতুক হিংসা, কুটিলতা, অন্যায়ভাবে অন্যের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, পেশা জীবনে অনৈতিকতার চর্চা, অধিক বিলাসী জীবনের মোহ মনের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। এটা এক ধরনের ব্যাধি, যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। মনের অজান্তে মানুষ আরো গুরুতর পাপ কাজের দিকে ধাবিত হয়। নিয়তির অমোঘ নিয়মে প্রকৃতির অভিশাপ মানুষকে ধ্বংসের দিকে টানে। নিজের ক্ষতির সাথে সাথে পরিবার-সমাজের ক্ষতিও যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা খুবই জরুরি। আর মানসিক সুস্বাস্থ্য শারীরিক ও সামাজিক জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

#

০৯.১০.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

হেড এন্ড নেক ক্যান্সার : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ডা. মো: আবু হানিফ

ক্যান্সার কি? ক্যান্সার একটি রোগের নাম যা মানুষকে আতংকিত করে এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চায়। এটিকে বলে কর্কট রোগ। কাঁকড়ার মতো যাকে ধরে তাকে ছাড়তে চায় না। কি কারণে এই রোগ হয়? ক্যান্সারের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। এর সুপ্ত রহস্য উদঘাটন করার জন্য বিস্তর গবেষণা চলছে। সাধারণভাবে যা বোঝা যায় তা হলো মানুষের শরীরে প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ থাকে। প্রতিটি কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। এই নিউক্লিয়াস হলো কোষের প্রাণ। কোষে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমজম। এই ক্রোমজমগুলো ডিএনএ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি ডিএন এর মধ্যে থাকে অসংখ্য জিন। এই জিনগুলো কোষের বিভিন্ন কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তথা মানুষের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জিনগুলো মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্টগুলো নির্ধারণ করে। এই অসংখ্য জিনের মাঝে কিছু কিছু জিন আছে যাদেরকে বলা হয় প্রি ক্যান্সার জিন অর্থাৎ তারা যেকোনো সময় ক্যান্সার জিনে রূপান্তরিত হতে পারে। আরেক ধরনের জিন আছে যাদেরকে বলা হয় টিউমার সাপ্রেসরজিন। এই জিনগুলোপ্রি ক্যান্সার জিনকে নিবৃত্ত করে রাখে অথবা একটি ব্যালেন্স অবস্থায় রাখে। ক্যান্সার সাপ্রেসর জিন যদি দুর্বল, অকেজো বা ডিলিট হয়ে যায় অথবা ডিএনএতে যদি ত্রুটি দেখা দেয় তখন প্রি ক্যান্সার জিনগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং ক্যান্সার জিনে পরিণত হয়। এই ক্যান্সার সেলটি তখন সকল নিয়ম কানুন অমান্য করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে এবং খুব দ্রুত একটি বড়ো টিউমারে পরিণত হয়। মানুষের যে কোনো কোষে যে কোনো সময় ক্যান্সার হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের ধ্বংসের বীজ তার নিজের মধ্যে বপন করা আছে। আর কিছু জিন আছে যারা জন্মগতভাবেই খারাপ এবং বংশ পরম্পরায় এই খারাপ জিন ট্রান্সমিট হচ্ছে। ফলে বংশগত ক্যান্সারে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়া ধূমপান, পান, সাদা, জর্দা, গুল, সুপারি, মাদক, ভাইরাস, রেডিয়েশন, বিভিন্ন ক্যামিক্যাল ক্যান্সার তৈরিতে সাহায্য করে এবং জিনের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে এবং ক্যান্সার সৃষ্টি করে। তাছাড়া ওজন বৃদ্ধি, শাকসবজি ও ফলমূলের ঘাটতি, কায়িক পরিশ্রমের অভাব, ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

এই ক্যান্সার সেলগুলি ক্ষ্যাপাটে আচরণ করে। তারা কোষের স্বাভাবিক নিয়মকে মানে না। প্রতিটি সেল নির্দিষ্ট সময় পরে মরে যায় এবং নতুন সেল তৈরি হয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। ক্যান্সার সেল তার স্বাভাবিক মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে এবং অমরত্ব দাবি করে। তারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। তাদের বৃদ্ধি জিয়োমেট্রিক প্রগ্রেসনে অর্থাৎ ১ থেকে ২, ২ থেকে ৪, ৪ থেকে ৮ ইত্যাদি। অল্প অক্সিজেনে বাঁচতে পারে। অন্য সেলকে ধ্বংস করতে পারে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রক্তের মাধ্যমে বা লসিকা নালির মাধ্যমে যেতে পারে। তাদেরকে বলে সাইকোপ্যাথ। ক্যান্সার সেল রক্তে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে। ক্যান্সার সেল নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন সেলকে বিনষ্ট করে এবং এক সময় মানুষকে মেরে ফেলে।

মানুষের শরীরে ২০০ প্রকার কোষ আছে। ১০০ প্রকার ক্যান্সার মানুষকে আক্রমণ করে। ক্যান্সার মৃত্যুর ২ নাম্বার কারণ। সারা বিশ্বে প্রতি ৬ জনে এক জনের মৃত্যু হয় ক্যান্সারে। আই আর সি (আন্তর্জাতিক এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে সারাবিশ্বে নতুন ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪.১ মিলিয়ন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪.২ মিলিয়ন। এই হারে বৃদ্ধি পেলে ২০৩০ এই সংখ্যা দাঁড়াবে ২১.৭ মিলিয়নে এবং মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ মিলিয়নে।

বাংলাদেশে ক্যান্সারের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। ২০১২ সালে গ্লোবক্যান এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় জনসংখ্যা ১৫ কোটি, ২৪ লক্ষ ৮ জন। ১২ লক্ষ ২৭ হাজার নতুন ক্যান্সার রোগী এবং ৯১.৩ হাজার ক্যান্সার জনিত মৃত্যু। প্রতি বছর ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ২ লক্ষ।

হেডনেক ক্যান্সার কী? নাক, সাইনাস, মুখ-গহ্বর, জিহ্বা, শ্বাসনালী, খাদ্য নালীর উপরিভাগ, লাল গ্রন্থির ক্যান্সারকে একত্রে বলে হেড নেক ক্যান্সার।

ভারতে প্রতি বছর ২ লক্ষ হেড নেক ক্যান্সার রোগী শনাক্ত হয়। সারাবিশ্বের ৫৬.৫ ভাগ হেড নেক ক্যান্সার ভারত উপমহাদেশকে ডিল করতে হয়। সাউথ ইস্ট এশিয়াতে হেড নেক ক্যান্সার অন্য দেশের চেয়ে বেশি হয়, এর প্রধান কারণ ধূমপান, পান, সাদা জর্দ্দা, সুপারি, গুল, এলকোহল এবং খাদ্যাভাস।

এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো ধূমপান। সিগারেটের ধোঁয়ায় ৪০০০ কেমিক্যাল থাকে, এর মধ্যে ৪৩টি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান এবং ৪০০ বিষাক্ত পদার্থ। এদের মধ্যে নিকোটিন, কার্বন মনোক্সাইড, ফরমালডিহাইড, হাইড্রোজেনসায়ানাইড আর্সেনিক, এমোনিয়া ও ডিডিটি অন্যতম।

রোগের উপসর্গ : হেড নেকের যে অংশে ক্যান্সার হয় সেই অনুযায়ী উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন নাকের ক্যান্সার হলে নাক দিয়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, রক্ত বের হয়। শ্বাসনালীতে ক্যান্সার হলে শ্বাসে কষ্ট হয় এবং স্বরের পরিবর্তন হয়। জিহ্বায় হলে ব্যথা হয়, খাবারের কষ্ট হয়, ঘা হয়। থাইরয়েড হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়। হেড নেক ক্যান্সার যেকোনো স্থান থেকে গলায় আসতে পারে এবং গলা ফুলে যায়।

বাংলাদেশে হেড নেক ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ এবং প্রতি বছর ৭০ হাজার নতুন রোগী হেড নেক ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। থাইরয়েড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় প্রায় ৭.৫ হাজার রোগী প্রতিবছর।

হেড নেক ক্যান্সারের রোগী দিন দিন বাড়ছে এবং ৬০ শতাংশ রোগী এডভান্স স্টেজে ডাক্তারের নিকট আসছে। বিলম্বে আসার প্রধান কারণ হলো অসচেতনতা, অবহেলা, রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত না থাকা এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। প্রথমে রোগীরা কবিরাজ, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি চিকিৎসা নিয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা করে। এতে করেও বিলম্ব হয়।

তাছাড়া আমাদের যে পরিমাণ ক্যান্সার হাসপাতাল আছে তাতে করে মাত্র ১০-১৫ ভাগ রোগীর চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব। বাকি রোগীরা নানা কারণে মারা যায়।

হেড নেক ক্যান্সার বিষয়টিও মানুষের কাছে নতুন। এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি প্রচার-প্রচারণা নেই। হেড নেক ক্যান্সার চিকিৎসার বিষয়ে এখনি মনোযোগ না দিলে এটা ভবিষ্যতে ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করবে।

ক্যান্সার হলে রোগীরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গরীব রোগীরই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে তারা নিঃস্ব হয়ে যায়। এক দিকে রোগীরা রোজগার করতে পারে না অন্যদিকে চিকিৎসার জন্য টাকা ব্যয় করতে হয়। ফলে সঠিক চিকিৎসা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইসব রোগীদের জন্য অনেক ক্যান্সার হাসপাতাল প্রয়োজন। যাতে তারা স্বল্প ব্যয়ে, বিনা খরচে ভালো চিকিৎসা পেতে পারে। অন্যান্য দেশে এর জন্য One Stop ক্যান্সার সেন্টার আছে। যেখানে রোগীদের সার্জারি, রেডিওথেরাপি, ক্যামোথেরাপি ইত্যাদি সব চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও কিছু হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

হেড নেক ক্যান্সারের প্রধান চিকিৎসা হলো অপারেশন। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সারের জন্য সার্জারিই যথেষ্ট। কিন্তু এডভান্স স্টেজের রোগীদের জন্য অপারেশনের পরে এডজুভেন্ট চিকিৎসা হিসেবে রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপির প্রয়োজন হয়। যাতে করে পরবর্তী সময়ে রোগটি দেখা না দেয়।

অপারেশনের ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে কিছু রোগীর রেডিওথেরাপি দিতে হয়। দেরি হয়ে গেলে রোগ পুনরায় দেখা দেয়। সেটা খুব খারাপ পরিস্থিতি কারণ তখন আর তেমন কিছু করার থাকে না। সেজন্য ক্যান্সার চিকিৎসা সম্পূর্ণ না করলে ভালো সুফল পাওয়া যায় না। কিছু রোগী দেশের বাইরে ক্যান্সার চিকিৎসা নিতে যায়। সেখানে দীর্ঘ অপেক্ষার লাইন, যাতায়াত অসুবিধা, ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা এবং যথেষ্ট আর্থিক ব্যয় ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। চিকিৎসা নেবার পর বার বার ফলোআপে যেতে পারে না। তখন তারা জটিল সমস্যায় পড়ে যায়। তাছাড়া প্রতিবছর শুধু ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে হেড নেক ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু কমপ্রিহেনসিব সেবা প্রদানকারী কোনো ক্যান্সার সেন্টার তৈরি হয়নি। হেড নেক ক্যান্সার সার্জনের সংখ্যাও খুব কম। হেড নেক ক্যান্সার চিকিৎসাটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি। এর সার্জারি জটিল এবং পরিশ্রমের কাজ। যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তাদের কষ্টের কোনো শেষ নেই। অথচ প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করালে ভালো হবার চান্স ৯৫ ভাগ। যদি স্বল্প ব্যয়ে ভালো চিকিৎসা দেওয়া যায় তবে অনেক রোগীকে চিকিৎসার আওতায় আনা যেতে পারে। একটি ভালো হেড নেক ক্যান্সার সেন্টার তৈরি এখন সময়ের দাবি। এই জন্য প্রয়োজন কিছু ডেডিকেটেড ক্যান্সার চিকিৎসকের। যারা ক্যান্সার রোগীদের সেবা প্রদানের জন্যে নিবেদিত থাকবেন।

আমাদের হেড এন্ড নেক ক্যান্সার সাপোর্ট ফাউণ্ডেশন বিনা পয়সায় অপারেশন, স্বল্প পয়সায় আউটডোর সার্ভিস, ক্যান্সার রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, সামাজিক পুনর্বাসন, টিভি, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যান্সার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ করছে। এখন আমরা একটি ভালো হেড নেক ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরির প্রক্রিয়ায় আছি। যেখানে স্বল্প পয়সায় বা বিনা পয়সায় উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা যায়।

#

২০.০৯.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চামড়া শিল্প

মো: রুবেল হোসাইন

চামড়া শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা এবং বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে চামড়া ও চামড়াজাত বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করে আসছে। বিশ্ববাজারে সবসময়ই বাংলাদেশের গরু, ছাগল ও মহিষের চামড়ার চাহিদা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের চামড়া বিশ্বখ্যাত। গত দু' দশকে বাংলাদেশ সরকারের এ খাতে অর্জন উল্লেযোগ্য। ফলে বিশ্বে প্রথম শ্রেণির চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুতকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক পশুপালনের জন্য সবুজ ঘাস ও খামার রয়েছে, যার কারণে এখানে প্রস্তুতকৃত চামড়ার গুণগত মান ভালো।

বাংলাদেশে উৎপাদিত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যসামগ্রীর প্রধান কাঁচামাল হলো কোরবানির পশুর চামড়া। এ বছর বাংলাদেশে কোরবানিযোগ্য মোট গরু ও মহিষের সংখ্যা ছিল ৪৪ লাখ ৫৭ হাজার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে এবারের ঈদে কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়ে বিভিন্ন জাতের ১ কোটি ১৫ লাখ ৮৮ হাজার প্রাণী যার মধ্যে রয়েছে গরু, ছাগল, মহিষ, উট, দুম্বা ও ভেড়া। এর মধ্যে ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ৭১ লাখ। সারাদেশের ৫ লাখের বেশি খামারি এবারের ঈদে কোরবানির পশু যোগান দিয়েছেন। কোরবানির পশুর যোগানে এখন স্বয়ংস্পূর্ণ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে কোরবানি, মিলাদ, বিবাহ, সুন্নতে খাৎনাসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তুলনামূলক বেশিসংখ্যক পশু জবাই করা হয়। এর মধ্যে একমাত্র কোরবানির পশুর মাধ্যমেই সারা বছরের ৪০ শতাংশ চামড়া উৎপাদন সম্ভব হয়। শতকরা ৯৫ ভাগ কাঁচা চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি, প্রধানত আধা পাকা ও পাকা চামড়া, চামড়ার তৈরি পোশাক এবং জুতা হিসেবে বিদেশে বাজারজাত করা হয়।

প্রসঙ্গত, এবারের কোরবানির ঈদের আগেই সরকার চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা চামড়ার দাম ৩৩ শতাংশ কমেছে। তাই এ বছর আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা চামড়ার দামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকার চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাছাড়া দাম নির্ধারিত না করলে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা সুযোগ বেশি পায় এতে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে চামড়া রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সরকার ঘোষণা দিয়ে চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবে নির্ধারিত মূল্য না পাওয়ায় অনেকে চামড়া বিক্রি না করে নষ্ট করে ফেলেন। এতে করে আমাদের কাঁচামালের অপচয় ঘটে এবং সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। চামড়ার দামের সাথে প্রস্তুতকৃত পণ্যের পার্থক্য থাকার কারণে কয়েক স্তর পার করে চামড়া ফ্যাক্টরিতে পৌঁছায়, এতে পণ্যের মূল্য বাড়তে পারে।

২০১৭ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল চামড়া শিল্পের নাম। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে সরকার এ উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুসারে ২০১০-১১ অর্থবছরে চামড়াপণ্যের মোট রপ্তানি ছিল ২৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের মোট রপ্তানি আয় ছিল ১১৩১ মি. মার্কিন ডলার যা ছিল মোট রপ্তানির ৩.৪ ভাগ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুসারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১২৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার। অধিকাংশ চামড়া এবং চামড়াসামগ্রী রপ্তানি করা হয় জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, রাশিয়া, ব্রাজিল, জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর এবং তাইওয়ানে।

ঢাকার সাভারে ১৯৯.৪০ একর জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক চামড়া শিল্পনগরী। এখানে মোট জমির ১৭ একর ব্যবহৃত হয়েছে কেন্দ্রীয় বজ্র শোধনাগার (সিইপিপি) নির্মাণে। প্রকল্প এলাকায় ২০৫টি প্লটের মাধ্যমে ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১১৪টি শিল্প ইউনিট তাদের উৎপাদন শুরু করেছে। অন্যগুলো অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছে। তাছাড়া ডাম্পিং ইয়ার্ড ও শ্রমিকদের বাসস্থানের কথা চিন্তা করে সিইটিপি' র পাশেই ২০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করা আছে। খুব দ্রুত সেখানে কাজ শুরু হবে বলে আশা।

চামড়াশিল্পের উন্নয়ন এবং পরিবেশের কথা চিন্তা করে হাজারিবাগের ২২২টি ট্যানারি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর এক বছরে সাভারের চামড়াপল্লিতে ১১৫টি কারখানা স্থানান্তর করা হয়। পুরোদমে উৎপাদনে যেতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বজ্র শোধনাগার (সিইটিপি) পুরো কার্যকর করার পাশাপাশি কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। সুতরাং পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ শিল্পে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে গুণগত মান ঠিক রেখে চামড়া রপ্তানি করতে সরকার আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ শিল্পের সাথে যেসব শ্রমিকরা জড়িত তাদের জন্য যে জায়গা বরাদ্দ সেখানে দ্রুত আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্প এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং রাস্তাঘাট নিয়মিত সংস্কার করতে হবে যেন ক্রেতারা অবাধে সেখানে যাতায়াত করতে পারেন। মালিকদের মধ্যে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত প্লটের দলিল হস্তান্তর করতে হবে। তাহলে ক্রেতারা আরো বেশি আগ্রহী হবেন এবং যে অভিযোগ করেন তা করার আর সুযোগ পাবেন না।

বাংলাদেশে এ খাতে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত পুমা, পিভোলিনোস, হুগো বস, এপেক্স, বে এম্পোরিয়াম ইত্যাদি বিখ্যাত কোম্পানি যে বাংলাদেশ থেকে চামড়া শিল্পের কাঁচামাল ব্যবহার করছে তা থেকেই বোঝা যায় যে, চামড়া শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

#

২০.০৯.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

কৃষিতে ঈষর্ণীয় সাফল্যঃ প্রয়োজন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

মোতাহার হোসেন

এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির দেশ, এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এসব সম্ভব হয়েছে অঞ্চল ও মাটির গুণাগুণ, ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ফসল উদ্ভাবন, লবণ, জলামগ্নতা, খরা এবং জলবায়ুসহিষ্ণু বীজ উৎপাদন, যথাযথ প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষিতে এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। গত ৯ বছর ধরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ছে, ভরে উঠেছে শস্যভাণ্ডার। এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির দেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করেনি, খাদ্য রপ্তানিও করছে। কৃষি বিপ্লবের অনন্য রূপকার ও মূল কারিগর হচ্ছে আমাদের দেশের আপামর কৃষক, কৃষাণি এবং কৃষিতে নিয়োজিত নারী শ্রমিক। এই বিপুল জনগোষ্ঠির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ কৃষিতে, খাদ্যে দৃশ্যমান বিপ্লব সাধন করে চলেছে।

'আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগেও মানুষ বছরে এক ফসল আবাদ করতো। এখন সময় বদলেছে, প্রযুক্তি, নতুন নতুন জাতের বীজের প্রচলনে এখন পুরো বছর ধরেই জমিতে চাষ হচ্ছে। এতে সরকারের বড়ো অবদান রয়েছে। আগে সারের জন্য হাহাকার পড়তো আবাদ মৌসুমে। এখন সার চাইলেই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় কীটনাশকও। এ কারণে মানুষ বছরব্যাপী এখন মাঠে ব্যস্ত ফসল উৎপাদন নিয়ে।' সম্প্রতি ফেনীর দাগনভুইয়ায় আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পথে বাড়ির সন্নিকটের একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন কৃষকের মধ্যে এমন কথা বার্তাই চলছিল। মূলতঃ কথাটা প্রসঙ্গক্রমেই উত্থাপন করলেন বয়োবৃদ্ধ মনির মিয়া। তাকে কয়েক দিন দোকানে আসতে না দেখে অন্য পরিচিত একই পাড়ার সাদেক আলীর জিজ্ঞাসা ছিল এত দিন তিনি কোথায় ছিলেন। এর জবাবে তিনি নিজের ব্যস্ততার কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করেন। সান্ধ্যকালীন এরকম নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এখন বিকেলের অবসরে, সান্ধ্যকালীন আড্ডায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ সময় কাটান। এটা সম্ভব হয়েছে এসব মানুষদের আর্থিক সফলতার কারণে। এর নেপথ্যে কৃষি, কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা ভাব, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়া, রাস্তাঘাট পাকা, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রামে কৃষিতে নিয়োজিত সদস্যদের কামাই রুজি করার মতো পরিবারের সদস্যের কেউ ঢাকায়, কেউ চট্টগ্রামে আবার কেউ কেউ বিদেশে চাকরি করায় তাদের হাতে এখন যথেষ্ট পয়সা থাকে। পাশাপাশি সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনায় দেশের কৃষিসহ সব খাতেই আজ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কৃষিতে এই সাফল্য বিশ্বের মানুষকে অবাক করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে, গত ৯ বছরের ব্যবধানে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৬০ লাখ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য যথাযথ কৃতিত্ব দিয়েছেন দেশের সাহসী,পরিশ্রমী কৃষকদের, ফসলের মাঠে যারা নিরন্তর শ্রম দিয়েছেন। অবশ্যই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে কৃষকদের সরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহায়তা, সাথে ছিল সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। শুধু মাঠে নয়, নানামুখী ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে কৃষির আরেকটি উপ-খাত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের নিরলস পরিশ্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। সাফল্য আসছে ধারাবাহিক গতিতে।

সরকার ফলপ্রসূ কৃষিবান্ধব নীতি নিয়ে কাজ করছে। কৃষকের প্রয়োজনীয় উপকরণ সার, বীজ, কীটনাশক এবং কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, সেচের ব্যবস্থা, কৃষি কার্ড বিতরণ, নিত্যনতুন উন্নত প্রযুক্তির জোগান দিয়ে যাওয়া এমন সাফল্যের পেছনে বড়ো নিয়ামক হয়ে উঠেছে। কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কৃষকদের মধ্যে প্রায় সোয়া দুই কোটি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলার কার্যক্রমে কৃষকদের ঘুরে দাঁড়ানো সহজ হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে চাল, গম, ভুট্টা উৎপাদন ছিল প্রায় ৩ কোটি ৩৩ লাখ টন, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ৩ কোটি ৯১ লাখ টনে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮ অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই উৎপাদন ৪০৭.১৪ লাখ মেট্রিকটনে পৌঁছেছে। একইভাবে বেড়েছে ডাল, পেঁয়াজ ও পাটের উৎপাদন। উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন জাতের বিভিন্ন ফসল।

ধারাবাহিক সাফল্যকে এগিয়ে নিতে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেশে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তাই কম জমিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য টেকসই পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। কৃষক আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সচেতন। কোন জাত নেবে, কী প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, কী ধরনের এবং কতটুকু সার-কীটনাশক দিতে হবে তা এখন তারা নিজেরাই যাচাই ও প্রয়োগ করে থাকে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে ৩৩টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গবেষণা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ কাউন্সিল একটি রূপকল্প দলিল ২০৩০ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি টিম গঠনের মাধ্যমে সারাদেশের মাঠপর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচি পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন করছে। বিটি বেগুনের চারটি জাত উদ্ভাবন, প্রতিকূল আবহাওয়া উপযোগী করে ধান ও গমের জাত উন্নয়নসহ পরিচর্যা কলাকৌশল নির্ধারণ করে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া তাপসহিষ্ণু গমের জাত ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের বীজ। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিশেষ জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের ৪৫৭ টন বীজ উৎপাদন ও ৬২৬.২৫ টন বোরো বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। বিএসডিসি সারাদেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলতি ২০১৭-১৮ মৌসুমে বিএডিসি মোট ১.৪৮ লাখ মেট্রিকটন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১.২৮ লাখ মেট্রিকটন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি সহায়ক হিসেবে সেচের জন্য ৫৮০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, দুটি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ৫৫৮ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ১১টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ১১.২১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ৬১০টি শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, ১১৮টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ১৪৯টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করা হয়েছে। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৭টি ফসলের ৩০টি জাত অবমুক্তকরণ ও ২২টি ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। দেশে গমের বাস্ট রোগ শনাক্ত হয়েছে। এ রোগের বিস্তাররোধে আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমের প্রক্রিয়া চলছে। অনুরূপভাবে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে ব্রি ধান ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ উদ্ভাবন এবং বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান ৭৪ উদ্ভাবন করেছে। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকার জন্য তিনটি লবণসহিষ্ণু সারির আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। কম মাত্রার গ্লাইসেমিক ইনডেক্সযুক্ত ধান ব্রি ধান ৪৬ ও ব্রি ধান ৬৯ চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI)- এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় আরবীয় খেজুরগাছের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। চরাঞ্চলে উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক চাষি বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। BSRI ডমেস্টিক কেন ক্রাশার যন্ত্র, সুগারবিট রুট রুট রোগ দমন প্রযুক্তি, সুগারবিট ক্যাটারপিলার পোকা দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, সুগারবিটের প্রমিতকৃত কৃষিতাত্ত্বিক প্রযুক্তি, বিএসআরআই পাওয়ার উইডার যন্ত্রের সফল ব্যবহার করা হয়েছে।

মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার সুপারিশমালা ২০১৬-এর আওতায় আধাবিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে ৪৬০টি উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকাসম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদকরণের জন্য ২০টি উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকাসম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কৃষকদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশ কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছর সমূহের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১৭৫৫০.০০ বিতরণ ২০৯৯৮.০০ ঋণ আদায় ১৮৮৪০.০০। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিতরণ ১৪৫২০.৪২ ঋণ আদায় ১৩৫৯৬.৯৯।

দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় কৃষি নীতিকে সামনে রেখে কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের এ কাজে সহায়তা করছে দেশের অগণিত পরিশ্রমী কৃষক। উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশ এগিয়ে যাবে টেকসই সমৃদ্ধির দিকে- এ বিশ্বাস, এই আস্থা এখন দেশের আপামর জনগণের।

#

২০.০৯.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

মৎসোৎপাদনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সফলতা

শাহ আলম বাদশা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবৎ ৫৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে ৪৬টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত-উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। মাঠপর্যায়ে এসব প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে মাছের উৎপাদন উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমবারের মতন বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ১৬ কোটি জনগণের দৈনিক মাথাপিছু মাছের চাহিদা ৬০ গ্রাম ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন কিন্তু উৎপাদিত হয়েছে ৪১ লক্ষ ৩৪ মেট্রিক টন। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে দেশে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাদুপানির ২৬০টি মৎস্যপ্রজাতির মধ্যে ৬৪টি প্রজাতি বর্তমানে বিপন্ন হলেও এ সময় কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে টেংরা, গুজি আইড়, চিতল, ফলি, কুচিয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা এসেছে। এ পর্যন্ত বিলুপ্তপ্রায় ১৬টি মাছকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের মাছ উৎপাদনে ব্যাপক আবদান রেখে চলেছে। পুনরুদ্ধারকৃত মাছের চাষাবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় বাজারে এদের প্রাপ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এসেছে। বিলুপ্তপ্রায় টেংরামাছের (*Mystus vittatus*) প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য এ প্রতিষ্ঠান যেমন ২০১৭ সালের জাতীয় মৎস্যসপ্তাহে রৌপ্যপদক লাভ করে তেমনই বিলুপ্তপ্রায় ১৬টি মৎস্য-পুনরুদ্ধার এবং দেশের মাছ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় সম্প্রতি ২০১৮ সালের সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট 'কেআইবি কৃষিপদক' প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সদরদপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। এর গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে- ময়মনসিংহের স্বাদুপানি কেন্দ্র, চাঁদপুরের নদীকেন্দ্র, খুলনাধীন পাইকগাছার লোনাপানি কেন্দ্র, কক্সবাজারের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তিকেন্দ্র, এবং বাগেরহাটের চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে রাঙামাটির নদী উপকেন্দ্র, বগুড়ার সান্তাহারের প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, যশোরের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, পটুয়াখালীস্থ খেপুপাড়ার নদী উপকেন্দ্র এবং নীলফামারীস্থ সৈয়দপুরের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র।

বিজ্ঞানীরা জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে ২০০৯ সালে দেশীয় রুই মাছের নতুন উন্নত জাত-উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন নদী-উৎস থেকে রুই মাছের বন্যজাত সংগ্রহ করে ক্রসব্রিডিং পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত প্রথম প্রজন্মের উন্নতজাতের এই রুই বিদ্যমান জাত হতে ১৬ গুণ অধিক উৎপাদনশীল। ফলে এ মাছের উদ্ভাবিত জাতটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হলে দেশে অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন মাছ পাওয়া সম্ভব হবে। এ জাতটি উদ্ভাবনের জন্যও ইনস্টিটিউটকে 'জাতীয় মৎস্যসপ্তাহ ২০১০' স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

এদেশে দুর্লভ প্রজাতির কুচিয়া মাছ অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণসম্পন্ন। দেশে এর চাহিদা তেমন না থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা যথেষ্ট। আন্তর্জাতিক বাজারে কুচিয়ার চাহিদা থাকায় ২০১৫ সালে নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে কুচিয়ার পোনা-উৎপাদনে সফলতা এসেছে। এ পোনা উৎপাদনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে নির্বিচারে কুচিয়ার আহরণ হ্রাস পেয়েছে এবং চাষাবাদ সহজতর হয়েছে।

অত্যন্ত সুস্বাদু কৈ মাছের দেশীয় প্রজাতির পাশাপাশি দেশে ভিয়েতনামী কৈ মাছের চাষ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অধিক মুনাফালোভী কতিপয় চাষী অধিক ঘনত্বে (৩-৫ হাজার/ শতক) কৈ মাছ পুকুরে চাষ করে। ফলে পরিবেশ-বিপর্যস্ত হয়ে কৈ মাছের ব্যাপক মড়ক দেখা দিলে ২০১৪ সাল থেকে পরিচালিত গবেষণায় কৈ মাছের মড়কের কারণ হিসেবে *Streptococicus agalactiae* নামক ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ জীবাণু দমনে ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে প্রতিরোধক ভেকসিনও তৈরি করেছে। উদ্ভাবিত কৈ মাছের ভেকসিন বিশ্বে এটাই প্রথম।

মিঠাপানির ঝিনুক (*Lamellidens marginalis* এবং *L. corrianus*) থেকে ইমেজমুক্তা তৈরির কৌশল-উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৭-৮ মাসেই ঝিনুক থেকে ১টি পুর্ণাঙ্গ ইমেজমুক্তা তৈরি করা সম্ভব। সাধারণত মোম, খোলস, প্লাস্টিক, স্টিল ইত্যাদি দিয়ে চাহিদামাফিক তৈরিকৃত নকশাকে ঝিনুকের ম্যান্টাল টিস্যুর নিচে স্থাপন করে ইমেজমুক্তা তৈরি করা হয়। ২০১৬ সালে বিদেশ থেকে সংগৃহীত গ্রামবিশিষ্ট বড়ো-আকৃতির মুক্তা-উৎপাদনকারী ঝিনুকও পুকুরে লালন-পালনসহ প্রজননের মাধ্যমে এর পোনা-উৎপাদনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ইলিশের উৎপাদনবৃদ্ধি ও সংরক্ষণে অভয়াশ্রম-স্থাপনের উদ্দেশ্যে চাঁদপুরের নদী কেন্দ্র হতে পাঁচবছর ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণায় নদীতে জাটকার প্রাচুর্যতা, পানির গুণাগুণ ও পানির প্ল্যাংটন (খাদ্যকণা) এর প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে ষষ্ঠ অভয়াশ্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। ইলিশ/ জাটকার ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম বাস্তবায়ন করা গেলে বছরে প্রায় ৪,৩০০ কোটি অতিরিক্ত জাটকা ইলিশ উৎপাদন হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা খুলনা জেলার পাইকগাছার লোনাপানি কেন্দ্রে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে নোনা-টেংরা ও পারশে-মাছের ব্যাপক পোনা-উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। নোনা-টেংরা মাছের এই প্রজননকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউটটি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ স্বর্ণপদক লাভ করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে জোয়ারভাটা-বিধৌত প্যারাবনসমৃদ্ধ মোহনা-এলাকা কাঁকড়ার আবাসস্থল। ডিম ও পোনা ছাড়ার জন্য পরিপক্ক স্ত্রী-কাঁকড়া গভীর সমুদ্রে পরিভ্রমণ করে বলে হ্যাচারিতে পোনা-উৎপাদনের জন্য ডিমবহনকারী বা মা-কাঁকড়া পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। ফলে পাইকগাছার লোনাপানি কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমিক গবেষণার মাধ্যমে এই পরিপক্ক মা (gravid) কাঁকড়া হতে প্রজননোপযোগী ডিমবহনকারী (berried) মা-কাঁকড়া উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ শুটকি তৈরির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তিকেন্দ্র সময়সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘদিনব্যাপী ব্যবহারোপযোগী "বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার" উদ্ভাবিত করেছে। ড্রায়ারটিতে সৌর ও বিদ্যুৎশক্তি উভয়ই ব্যবহার করা যায়। ফিশ-ড্রায়ারের মূল কাঠামো মেটালিক যা জিআই পাইপ/ এ্যাংগেল বা এসএস-বার দ্বারা তৈরি।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উন্নত প্রযুক্তি-উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশে মৎস্য উৎপাদনবৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রার্জনের জন্য বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের আমলে গত ৮ বছরে ইনস্টিটিউটে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদফতর ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ প্রচেষ্টা বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে ১৬ কোটি জনগণের চাহিদাপূরণ করার পর অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদনেও সফলতা দেখিয়েছে। আমরা বহুবছর পর হারিয়ে যাওয়া "মাছে-ভাতে বাঙালি" প্রবাদটিকে আবার পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি।

#

১৮.০৯.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ